অতীতের ধ্যান এখন ইয়োগা, কুস্তি থেকে জিম, ওয়ার্মআপ, স্ট্রেচিং, ফ্রি-হ্যান্ড, ফিজিওথেরাপি বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম সম্পর্কে যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এক্ষেত্রে শরীরচর্চা বিভাগ ব্যায়ামের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা: যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর তাদের সকল কর্মকাণ্ডের উপর একটি বার্ষিকী প্রকাশ করে থাকে। এই ধরনের প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় লেখা আহ্বান করে। অতি সহজেই একজন শিক্ষার্থী এখানে লেখা জমা দিতে পারে। লেখা প্রকাশিত হবার পর তাদের মনোবল অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পরবর্তীতে তারা নিজেকে এই বিজ্ঞান চর্চায় আরো অধিক মনোনিবেশ করতে পারে। বার্ষিকী অতীতে এভাবে প্রকাশিত না হলেও যেকোন লিখিত উপাত্ত ও বিজ্ঞানের ইতিহাস বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বা জাদুঘরে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থী কর্তৃক দেয়ালিকা লিখন তাদের বিজ্ঞান চর্চার আর একটি কার্যকরী দিক।

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাগার: বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক ক্লাসে অংশগ্রহণ করে। সেখানে তারা বিভিন্ন প্রাণীর দেহ, কঙ্কাল, রাসায়নিক দ্রব্য, মডেল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে চর্চার সুযোগ পায়। পূর্বে এই ধরনের গবেষণাগার ভিত্তিক লেখাপড়ার এতটা প্রসার ছিল না। তবে শুধু অ্যালকোহল বা ফরমালিনে মৃত প্রাণীকে রাখা হতো। বর্তমানে এসব সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণী চর্ম প্রতিরূপ পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেছে যা সত্যিই পৃথিবীব্যাপী প্রশংসার দাবিদার। যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারের ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চা কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নিজেকে গবেষক পেশায় নিয়োজিত করতে পারে। অতীতের ফ্রি-হ্যান্ড অঙ্কনের সাথে বর্তমানে আধুনিক ফটোগ্রাফির সংযোজন ঘটিয়ে তাকে আরো অধিক প্রাণবন্ত করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ের উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে পারে।

বিজ্ঞান বক্তৃতা: অ্যারিস্টটল (৩৮৫-৩২২ খৃষ্টপূর্ব) তাঁর শ্রেণিকক্ষে অনুসারীদের জ্ঞান দিতেন। তখনকার দিনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধু সামান্য প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পন্ন হতো। এখনকার মতো এত বড় মঞ্চে অসংখ্য জনতার প্রশ্নের উত্তর এবং সেগুলির নথিপত্রসহ উপস্থাপন এমনটা ছিল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগিতা এখন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। এজন্য একজন শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি বিজ্ঞান চর্চা করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। এখন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে তারা নিজেদের দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে। তাছাড়া বিজ্ঞান মেলার মাধ্যমে তারা নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটাচ্ছে। অতীতের অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান জ্ঞানই হলো এখনকার বিজ্ঞান বক্তৃতা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সর্বোপরি তাদের সামাজিক অবস্থান।

প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন: বন্যপ্রাণী, পশুপালন, পাখি পালন, বাহারি রঙিন মাছ ব্যবস্থাপনা ও তাদের সংরক্ষণ এগুলি মানুষের আদি নেশা ও পেশা বলে বিবেচিত। অতীতের অনেক রাজা-বাদশা তাদের বাড়িতেই এই ধরনের জীবজন্তু পুষতেন। তবে এখনকার মত এমন পরিবেশে তাদের লালন-পালন করতেন না। যতই দিন যাচ্ছে আমরা বিভিন্ন প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে অবগত হচ্ছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় শিশুদের আনন্দ ও প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভের নিমিত্তে ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা তৈরী করা সম্ভব। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুকুরে মাছ চাষ ও তার আশেপাশে হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন করে এই বিজ্ঞান চর্চাকে আরো গতিশীল করা যেতে পারে।

উদ্যানবিদ্যা: সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কম-বেশি গাছপালা থাকে। তাছাড়া টবে বাহারি গাছও রোপণ করা হয়। অতীতকালে জনসংখ্যা কম থাকাতে বৃক্ষরাজির সংখ্যা অধিক থাকলেও তা ছিল মূলত অগোছালো। আধুনিক বিশ্বে এই সকল বৃক্ষকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে (বনজ, ফলজ, ভেষজ, বাহারি) উদ্যানবিদ্যা বা নার্সারী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা বিজ্ঞান চর্চার একটি দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। জীনতত্ত্বের জনক জোহান মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) তার বাবার নার্সারী থেকেই জীনতত্ত্বের ধারণা লাভ করে একসময় বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানের সকল গাছের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করা যেতে পারে। তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভের পাশাপাশি তাদেরকে প্রকৃতির মাঝে এনে সকল বৃক্ষের শ্রেণিবিভাগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান চর্চা ছাড়া জীবন অচল। সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ ছিল, আছে এবং থাকবে। শুধু প্রযুক্তির ছোঁয়াতে এখন তা বিকশিত হয়েছে মাত্র এবং এই বিকশিত জ্ঞানের জন্যই আমাদের শিক্ষার্থীরা আরো নিত্য নতুন আবিষ্কারে ব্যস্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে, কাজেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তাদেরকে সকল সময়েই সময়োপোযোগী বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। বিজ্ঞান চর্চা ছাড়া কোনভাবেই সুস্থ জাতির পদচারণা সম্ভব নয়। তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক উপাদানকে কাজে লাগিয়ে, শিক্ষকদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে, প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণ করে এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান চর্চাকে প্রযুক্তিতে স্থাপন করে অতীতের সকল জ্ঞানকে পরিমার্জিত করে তা মানব কল্যাণে কাজে লাগানো সম্ভব। কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যেহেতু উক্ত সকল উপাদানের সমন্বয় সেহেতু প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চা এখানেই সম্ভব।

মো. মহসীন আলম
সিনিয়র শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

হতাশা ও উত্তরণের উপায়

দুনিয়া আমাদের সকলের জন্যেই একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। আমাদের সকলকেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর প্রকৃত বান্দাদের বেছে নেন। এই পরীক্ষা যে কোন ভাবেই হতে পারে। হতে পারে শারীরিক কিংবা মানসিক, হয়ত অর্থকষ্ট দিয়ে নয়ত প্রচুর অর্থ দিয়ে। এ ভাবেই প্রতিনিয়ত আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি। তবে এই শেষ জামানায় ঈমান রক্ষার্থে আমাদের কঠিনতর পথ অতিক্রম করতে হতে পারে। নানা রকম কঠিন রোগব্যাধি আবিষ্কৃত হচ্ছে, যা আগে ছিল না। কিন্তু রোগ যে শুধু শরীরেই বাসা বাঁধে তা নয়। আমরা অনেকেই বর্তমানে অবসাদ, হতাশা এই মানসিক রোগগুলোতে আক্রান্ত, যার একটি বৃহৎ অংশ হলো যুব সমাজ।

অতিরিক্ত টেনশন হচ্ছে? আপনি কি কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন? মূল্যবান কিছু হারিয়ে গেছে? ব্যবসায় লোকসান হয়েছে? তবুও চিন্তিত হবেন না। হতাশ হবেন না। কারণ যা হারাবার তাই হারিয়েছে। যা ঘটার ছিল তাই ঘটেছে। শত চেষ্টা করেও কি সবকিছু আর ফিরে পাবেন? বরং চিন্তায় চিন্তায় আপনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বিষণ্নতা আপনাকে পেয়ে বসবে। আপনি বিমর্ষ হয়ে পড়বেন। শরীর খারাপ হবে। অতিরিক্ত টেনশনে আপনার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকও হতে পারে। তাতে আপনার মৃত্যুও ঘটতে পারে। ঠিক কিনা বলুন? তাই বিপদে ঘাবড়াবেন না। নিজেকে দৃঢ় রাখুন। কোন অবস্থাতেই মনোবল হারাবেন না। আর আল্লাহর উপর ভরসা করুন, তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখুন। মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা করবেন না। সন্তানদের জন্য সম্পদের পাহাড় গড়তে গিয়ে নিজের জীবন দুর্বিষহ করবেন না। বরং সন্তানদেরকে সম্পদে পরিণত করুন। হতাশা মুমিনের লক্ষণ নয়। কারণ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'মুমিনের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।' (আল কুরআন ৩০:৪৭) যেখানে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজে তাঁর বান্দার দায়িত্ব নিয়েছেন-সেখানে আমাদের হা-হুতাশ করে সময় নষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। কেননা দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা আমাদের করে তোলে অস্থির। ঠাণ্ডা পানিও তৈরি হয় বিষে, মনোরম উদ্যান পরিণত হয় মরুভূমিতে। চারপাশের পরিবেশকে মনে হবে কারাগার আর নিজ ঘরকে জেলখানা। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজের জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলবে। আর এ সময় যে কেউই ভুল পথে পা বাড়ায়।

হতাশার কারণে দুর্বল চিত্তের অনেক মানুষ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। বলুন- ঠিক কি না? তাই বিপদে ঘাবড়াবেন না। কঠিন পরিস্থিতিতেও মেরুদণ্ড সোজা রেখে দৃঢ় চিত্তে উঠে দাঁড়ান। কোন অবস্থাতেই মনোবল হারাবেন না। কারণ 'বিশ্বাসীরা সফল হয়' আল কুরআন (২৩:১)। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার এই বাণী স্মরণে রেখে ঘুরে দাঁড়ানোই একান্ত কর্তব্য। এই হতাশা থেকে বেরিয়ে আসার পথ একটাই। সেটি হল ধৈর্য ও মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।

তাই আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। তাকওয়াপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে। তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা করা যাবে না। কারো মন্দ কথায় বিষণ্ন হওয়া যাবে না। কখনো উত্তেজিত হওয়া যাবে না। কারো প্রতি জুলুম করা যাবে না। অভাব অনটনে বিচলিত হওয়া যাবে না। দুঃখ কষ্ট সহজে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। হিংসা-লোভ করা যাবে না। কথায় বলে: লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে হবে। দুচোখ ভরে বিশ্বজগতের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে হবে। সাগর নদী আর আকাশের দিকে তাকিয়ে মনটাকে বড় করতে হবে। সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে। জীবনটাকে সাজিয়ে তুলতে হবে সত্য ও সুন্দরে। নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, বদলে দিতে হবে জীবনের গতিপথ। খুঁজে নিতে হবে মুক্তির রাজপথ। দ্বীনি বই বেশি বেশি পড়তে হবে। মানুষকে দ্বীনি ই'লম দান করতে হবে। যার প্রতিদান আল্লাহ দিবেন। আল্লাহর দেয়া অগণিত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

আমরা যদি একটু ভেবে দেখি, নিজ পায়ে ভর দিয়ে আমরা হেঁটে বেড়াই! অথচ বহু মানুষের পা-ই নেই। আমরা নাক ডেকে ঘুমাই! অথচ বহু মানুষের চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। আমাদের পেট পরিপূর্ণ। অথচ, বহু লোক ক্ষুধার্ত। তাই আমাদের যা নেই তা নিয়ে আফসোস না করে, যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন বেশি বেশি তেলাওয়াত করতে হবে। কুরআনী জিন্দেগী গড়ে তুলতে হবে। হ্যাঁ, হঠাৎ করে যদি বিপদ এসে পড়ে তবে দিশেহারা না হয়ে ধৈর্যের মাধ্যমে তা মোকাবেলা করতে হবে।

বিপদ সাময়িক। এই আসে এই চলে যায়। সুখের পরই দুঃখ, দুঃখের পরেই সুখ। সুখতো দুঃখের সাথেই মিশ্রিত। জীবনতো দুঃখের জন্য নয়। মনে রাখা দরকার অসুস্থতার সাথেই সুস্থতা। ক্ষুধার পরে তৃপ্তি। পেরেশানির পর শান্তি। অতএব হতাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহ্ যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। তাই দুশ্চিন্তা পরিহার করুন, হতাশা ঝেড়ে ফেলুন। 'আল্লাহর রহমত হতে কখনো নিরাশ হবেন না। কাফের ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয় না'। সূরা ইউসুফ (১১:৮৭)।

হে আল্লাহ্! আপনি মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ, দয়াবান, কত সুন্দর মধুময় আপনার নাম। আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন, রহম করুন। হে আল্লাহ্, আমরা মুমিন। আমরা হতাশ হই না, নিরাশ হই না। আপনার উপর আছে আমাদের পূর্ণ ভরসা। আপনার যে কোন সিদ্ধান্তের উপর আমরা যেন সব সময় সন্তুষ্ট থাকতে পারি, সে তৌফিক দান করুন। আমীন।

ছড়া ও কবিতা

রাফিয়া জামান
শ্রেণি: দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
রোল: ১৬

মা

আজ হৃদয়ে একখানা ছবি
ভাসে কেবল পটে,
যার হাত ধরে এসেছি আমি
এই ধরণী তটে।

সারাদেহখানি উঠেছে গড়ে
যার স্নেহ আর পরশে,
যৌবনে এসে হেলাফেলা করে
কাটাচ্ছি দিন সরসে।

বহুদিন পর আজ আমার মনে
জাগে সেই সুদিনের স্মৃতি,
ছিলাম সুখে তার সনে
বৃক্ষ মাঝে যেমন বৃতি।

চলো সকলে আজ সদলবলে
মায়ের কাছে ফিরে যাই,
মর্যাদা আর ভালোবাসার ছলে
তাঁর কাছে ক্ষমা চাই।

গোলাম কিবরিয়া মমিন
শ্রেণি: একাদশ
রোল: ১৬১

হে প্রিয় বঙ্গ

হয়তো কখনো-
পুড়ে ছাই হবো গ্রীষ্মের তাপদাহে
ডুবে যাবো বর্ষার পানিতে
বর্ষার বৃষ্টি ধোয়া আকাশ শরতে হয়ে উঠবো
নির্মল।

হয়তো-
লুকাবো হেমন্তের সোনালি ফসলের মাঝে
হারিয়ে যাবো শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে
অথবা মিলিয়ে যাবো ঋতুরাজকে সঙ্গী
করে।
পাবে না খুঁজে কেউ,
দেশ, মহাদেশ, পৃথিবীতে,
তবুও কখনো ভুলবো না তোমায়
হে প্রিয় বঙ্গমাতা।
ভালোবেসে যাবো
এই হারিয়ে যাওয়ার মাঝে।

আবির আল রিফাত
শ্রেণি: প্রথম (ইভি), রোল: ৪০

গাছের জন্য

গাছ কেটো না, গাছ মেরো না
গাছ আমাদের ভাই,
মন দিয়ে আজ শোনো সবাই
বলতে যেটুকু চাই।
গাছের মতো এমন ভালো
বন্ধু বেশি নাই।
দেয় সে ছায়া, তারই জন্যে
বিশুদ্ধ হাওয়া পাই।

সাদিয়া সুলতানা সপ্তর্ষি
শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান), রোল: ২৫৪

দৃঢ় আমি

আমি দৃঢ়, দৃঢ় চিত্তের
ছুটছি প্রতিনিয়ত সে প্রশস্ত পথে,
যে পথ চির ন্যায়ের, চির সত্যের।
আছে শত স্বপ্ন, শত ইচ্ছে
যেসব জেগে জেগে প্রতিমুহূর্ত এ দুটি চোখ দেখছে।
আমার আমি অপার সম্ভাবনাময়,
যে ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করে, বড়ই মূল্যবান এই সময়।
পদে পদে ফাঁদ ও শত্রুর ছলনায়,
সেসব ভীত সন্ত্রস্ত মনের কোণায়,
জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সাহসিকতার আলো,
যা মুছে দেয় অন্তরের সব কালো।

আমি দৃঢ়, দৃঢ় চিত্তের
শিখছি কী করে হয় রুখতে,
সকল তুচ্ছতা, হীনম্মন্যতাকে।
নিভু নিভু শুভ্র স্বপ্ন ও প্রতিভার শিখায়,
দৃঢ় আমার আমি শক্তিশালী আলো জ্বালাই।
স্বচেষ্টা, সচ্চিন্তাকে উপেক্ষা করে যে সত্তা,
সে ছড়ায় শুধু ছলনা ও মিথ্যা।
সে পথ ভুলে বীরের পথে পা মিলিয়ে,
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও শ্রমের বিনিময়ে,
এই দেশে, সমাজ ও জাতিকে নিয়ে যেতে চাই এগিয়ে।

সাহিব আহমেদ সিয়াম
শ্রেণি: নবম, রোল: ০৩

রঙিন ফাগুন

শীতের আলসেমি কাটানোর পরে,
নরম রোদ উঁকি দিল ঘরে
ঝিরিঝিরি বাতাসের দোলা লাগে গায়,
চঞ্চল হয় মন উদাস হাওয়ায়।
মহুয়ার বনে অলি করে গুনগুন,
এল বুঝি ফুলে ফুলে সুখের ফাগুন।

কৃষ্ণচূড়ার ডালে কোকিলের ডাক,
গাছে গাছে দেখা যায় মৌমাছির চাক।
ছোট খাল, ছোট নদী, ঝিকিমিকি জল,
গাঁদা ফুলে প্রজাপতি নাচে চঞ্চল।
ঝোপেঝাড়ে টুনটুনি ডাকে টুনটুন
বনে বনে এল আজ রঙিন ফাগুন।

মো. রিফাত আল হৃদয়
শ্রেণি: দশম (বিজ্ঞান), রোল: ৫৪

আমার দেখা

দিবসের বার্তায় গগনে যখন সোনালি আলো ফোটে,
দোয়েল, চড়ুইর কিচিরমিচির সুরে আমার দু'চোখ মেলে
সবুজে সবুজে ভরা গাছের সব নরম পাতা,
কিচিরমিচির যেন দোয়েল আর টুনটুনির জাতীয় ভাষা।
মাঠে মাঠে ধানের মেলা মনে দেয় প্রশান্তির দোলা,
সুখের স্বপ্নে মনের মাঝে ভাসাই আমি ভেলা।
একটু যখন সকাল হলো ঋতু যেন হেমন্ত,
জারি-সারি ধরে কৃষকেরা তাই ধান কাটতে ব্যস্ত।
এলো আবার যার যার খুশির আমেজ নিয়ে হেমন্ত,
গাঁয়ে আনন্দের ধুম লেগেছে, চলছে উৎসব নবান্ন।
হেমন্তে ধানের আবাদ কৃষকের হয়নি তো মন্দ,
কখনোই তারা করে না একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব।
দিক দিগন্তে চোখে পড়ে অবারিত ধানক্ষেত রাশি রাশি,
কৃষকের মুখে যেন, আনন্দে অশ্রুকান্না শত আশার সোনালি হাসি।
দুপুর যখন হতে থাকে দিন কাটে নানা কিছু দেখে,
প্রকৃতি যেন সাজতে থাকে তার উজ্জ্বল রঙের বেশে।
দুপুর রোদে কৃষক ক্ষেতে ধান কেটে হয় ক্লান্ত,
বধুর মরিচ-পেঁয়াজ আর পান্তাভাতে ক্ষুদ্র জীবন যেন ভালোবাসায় সিক্ত
অবশেষে দুপুর যখন কিরণ কমিয়ে শান্ত হলো খানিক,
মনে যেন বেজে উঠল হাজার রত্নের মানিক।
গ্রামীণ মানুষের মনে এলো সুখ-শান্তি আর স্নিগ্ধতার আশা,
শান্ত বিকেলে টংঘরে বসে প্রকাশ করে তাদের মনের ভাষা।
দিবসের বিদায় বার্তায় রবির সোনালি কিরণ যায় আড়ালে চলে,
রাতের শুভেচ্ছায় যেন আকাশ লক্ষ তারার মেলা জমে,
ঝোপঝাড় আর স্বর্ণলতা জোনাকির স্নিগ্ধ আলোতে ভাসে
নিশিরাতে ঠাণ্ডা বাতাসে কত সুখ আহারে!
আকাশের তারার প্রতিচ্ছবি আমি দেখি স্বচ্ছ পুকুরে।
নভোমণ্ডল দেখতে দেখতে বিমোহিত হলাম আমি মনের কী আবেগে
পুরো আকাশ যেন প্রজ্বলিত হাজার হাজার তারার আবেশে।
আমি তারার দিকে চেয়ে থাকি দিয়ে পলক ভরা দৃষ্টি,
দয়াময় পরম-দয়ালু সৃষ্টিকর্তার যেন অপরূপ সৃষ্টি।
সবুজে ভরা মায়াবি গ্রামে এসবই আমার দেখা,
যা ভুলিয়ে দেয় আমার কোমল মনের সকল ব্যথা।

মো. ফাহিম আল-কাউসার
শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান), রোল: ২৬৪

পা মাটির অপেক্ষায়

পা মাটিতে পড়ে না আমার
থাকি আমি শহরে,
চামড়ার জুতোয় আবদ্ধ আমি
দেশটা বহুদূরে।

আগে শুনতাম শহর নাকি
অন্যরকম দেশ
ইট, সিমেন্ট আর কংক্রিটে
বেশ! মানিয়েছে বেশ!

কিন্তু পা মাটিতে পড়ে না আমার
চামড়ার জুতোয় আবদ্ধ,
খালি পায়ে চললে এ মাটিতে
লাগে বেশ শক্ত।

মাটি এখানে অবস্থান করে আছে
নিজের সর্বোচ্চ নিয়মে,
পুড়িয়ে মাটি, বানিয়ে দালান
মানুষ কি শান্তি পাবে!

পা মাটিতে পরে না আমার
অশান্তিতে ভুগি;
দেশের মাটিতে প্রতিদিন স্বপ্নে
নিজস্ব নিয়মে হাঁটি।

দেশের মাটি তো আর মাটি নয়
যেন মায়ের আঁচল,
যে আঁচলে বাঁধা আমি
চল! গ্রামে চল!

চলোনা আরো একটিবার
ছুঁয়ে দেখি সেই মাটি,
শৈশব যেখানে খেলা করে আজও
আর ডাকে আমায় চুপিচুপি।

চর

জিসান মাহমুদ
শ্রেণি: একাদশ (মানবিক), রোল: ০৮

দিনভর বৃষ্টি। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। যেন কেয়ামতের আগে আল্লাহ্‌র শেষ গজব এই বৃষ্টি। গতবারের চেয়ে এবারের বন্যার গলা বড়। দোতলা মসজিদটা পর্যন্ত ডুবে যায় অনায়াসে। ঘরে ঘরে অভুক্ত মানুষ। চারিদিকে বন্যার পানি। তবু সুখ খবিশ মিয়ার চোখে-মুখে। নদীর মাঝখানটায়, কবরস্থান থেকে সোজা দক্ষিণের জায়গাটায় পানি মাত্র তিন বার মাপ পড়েছে কালকে। বন্যা শেষ হওয়ার অপেক্ষা শুধু, তারপরই দিগন্তজোড়া একটি চরের মালিক হবে বুড়ো খবিশ মিয়া, বাড়বে তার ধানের গোলা, বাড়বে তার সাম্রাজ্য- ভাবলেই চোখ চকচকিয়ে ওঠে তার।

খবিশ মিয়ার মেজো ছেলে মন্তু মিয়া। গ্রামের সব জোয়ান ছেলেদের এক করে লাঠি চালানো শেখানোর দায়িত্ব তার। বড় বড় আধলা বাঁশ কাটা হয়েছে কবরস্থান থেকে। দূর গ্রাম থেকে এসেছে দুই লেঠেল। গত বছরের বদলা তোলা চাই। মন্তুর বড় ভাইটি এই লাঠালাঠিতেই প্রাণ হারালো গত বছর।

"আমগো একডা ঘর নয়া চরে হইবো তো, মাইজা মিয়া?" নাল্টু শেখ জানতে চায়। দরিদ্র এই ছেলেটির পরিবার গত এক বছরে চারবার নদীর পেটে ঘর খুঁইয়েছে।

"হইবো, হইবো। দখলডা করবার দে। বালুদিয়ার চর আমগোই হইবো। ওই শালাগো বদলা উসুল কইরাই ছাড়মু।"– ঝাঁঝালো উত্তর মন্তু মিয়ার। গালিটি দেয়া হয় নসরৎপুরের শেখদের উদ্দেশ্য করে। লাঠালাঠি আর চর দখলের খেলায় এ গ্রাম দুটির মানুষ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ওপারের শেখদের সাথে এপারের মিয়াদের শত্রুতা কয়েক পুরুষ ধরে। বছরান্তরে তারই ঝালাই হয়।

দিন যায়। খবিশ মিয়ার কাছে এবারের বর্ষা ছয় মাসের ঠাহর হয়। শুধু অপেক্ষা। বোধ হওয়ার পর থেকে চর দখলের খেলা দেখে আসছে বুড়ো। গ্রামের জোতদার সে। প্রকাণ্ড এক বাড়ি আছে তার, আছে সহায় সম্পত্তির পাহাড়। তবু যেন চর জাগতে দেখলেই দখলের নেশাটা পেয়ে বসে।

নাম তার খবিশ ছিল না তো। কালে কালে লাঠালাঠির যুদ্ধে-পড়ে আজ এই নাম তার। গাঁয়ের নেতা বলে মান্য করে সবাই। এই চর না পেলে সম্ভ্রম থাকবে না।

একদিন দিন আসে। মন্তু মিয়া ডাক দেয়, "চলো সব মরদের দল, আমগো জমি বুইজ্জা লওনের সময় আইসা গেসে।" মন্তুর ডাকে সব পুরুষেরা এক হয়। নাল্টু শেখও প্রস্তুত হয়। নদীর ধারে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটি থেকে বিধবা মাকে রেখে পা বাড়ায়। আসার সময় নাল্টু মাকে বলে আসে, ঘরের জন্য জমি নিয়ে সে ফিরবে।

নৌকায় করে দলে দলে বালুদিয়ার মানুষ নতুন চরে এগোয়। উল্টোপাশ থেকে নসরৎপুরের লোকদের আসতে দেখা যায়। সবার হাতে লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যে চরের বালুতে গড়াবে লাশের মিছিল। দু'দিক থেকে দু'দল এসে পৌঁছায়। এপারে যুদ্ধের ডাক দেয়। শুরু হয় লাঠালাঠি।

এই লাঠিয়ালদের সবার পরিচয় এরা সর্বহারা। সবাই এসেছে জমির আশায়। যুদ্ধ বলে কিছু নেই। জমি না পেলে হয়তো না খেয়ে মরতে হবে, তার চেয়ে এ বীরমৃত্যু ঢের ভালো। মন্তুর বাহিনীর শাঁ শাঁ লাঠির ঘোরে-বেঘোরে পড়তে থাকে দৌলত শেখের বাহিনী। মন্তু মিয়া আর দৌলত শেখ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। মাঝে মাঝে অশ্রাব্য হুঙ্কার দেয়। তারা মনিব, নেতা। যুদ্ধ তারা করবে না, করাবে- এটাই নিয়ম। যুদ্ধ হয় না বেশিক্ষণ। অর্ধেক লাঠিয়াল খুঁইয়ে পিছু হটে তার দলটি। ক্ষোভে গজরাতে গজরাতে একটি লাঠি ছুঁড়ে মারে দৌলত। আচমকা তা গিয়ে লাগে নাল্টুর মাথায়। মাথা ফেটে রক্ত গড়ায়। নাল্টু মারা যায়। অন্য লাশগুলোর সাথে তারটিও মেঘনায় ডুবিয়ে দেয়া হয়।

বালুদিয়ার চর খবিশ মিয়ার হয়। কিন্তু নাল্টুদের আর তাতে জমি পাওয়া হয় না। তাদের আশ্বাস বাড়ে পরের বারের নতুন চরটি জেগে ওঠার আগ পর্যন্ত। ততদিনে আরো চারবার ঘর গিলবে মেঘনার গোগ্রাস। যারা মরে তারা বেঁচে যায় মঙ্গা আর নদী ভাঙ্গন থেকে। যারা বাঁচে তারা আবার তৈরি হয় নতুন কোন চর দখলের জন্য। অথচ মিয়া আর শেখদের এই যুদ্ধের সৈনিক সরল-সোজা কৃষকগুলো জানে না, কোন চর তাদের নিয়তি বদলাতে পারবে। যুগ যুগ ধরে এই অংকে আটকে থাকে নদীপাড়ের সর্বহারা শ্রেণির যাপিত জীবন।

তারুণ্যের প্রাণশক্তি

এ. কে. এম. মীর মোশাররফ হোসেন
শ্রেণি: দ্বাদশ (মানবিক), রোল: ১৮

তারুণ্য হলো অনুপ্রেরণার অজেয় শক্তি। তরুণেরা নানা দুর্যোগ, ঝড় আর নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকে। একটি দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নয়নের কারিগর এই তরুণরাই। তারুণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নতুন নতুন পরিকল্পনা করা ও তা বাস্তবায়ন করা। তারুণ্য মানে না কোনো বাধা। জল, স্থল, আকাশ ও মহাকাশের কোথায় নেই তারুণ্যের ছাপ! অসম্ভবকে সম্ভব করতে ঝুঁকি নেওয়ার বয়স তারুণ্য। কিন্তু বর্তমানের তরুণরা নিজের সফলতা দিয়ে রাষ্ট্র ও জাতি গঠনে স্বপ্ন দেখে না। আর কেনই বা দেখবে? তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তারা শক্তিহীন ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন জীবন-যাপন করছে। অথচ বাংলায় এ তরুণরাই তো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ৪৭-এর দেশবিভাগ, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৭১-এর স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে। ফলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। আর তরুণরা সফল হবে যদি তারা বুকে দৃঢ় মনোবল ধারণ করে। তারুণ্যময় ছাত্রজীবনে রয়েছে আনন্দে উল্লাসে মাতামাতি। এই তারুণ্যের বয়সে তরুণরা বন্ধুদের সাথে আজ এখানে ঘোরাঘুরি, তো কাল অন্য জায়গায়। জীবন এখানে দীপ্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে- "মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম... মোরা প্রকৃতির মতো স্বচ্ছল।" তবে কখনো কখনো গানে গানে ছড়িয়ে পড়ে তারুণ্যের উদ্দামতা কখনো ছোট ছোট খেলায় মেতে উঠে তারুণ্য ভরা সবুজ প্রাণ। কিন্তু তাই বলে শুধু আনন্দ -আড্ডাতে পার করা উচিত নয় এ বয়স। এ বয়সে থাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেওয়ার শক্তি। এ বয়সে সাফল্য লাভ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া যায়। তুমি নিজের প্রতিভা ও দক্ষতা দিয়ে দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিতে পারো এ বয়সে। তুমি কি জানো, সাফল্য কী? সাফল্য হলো ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি এবং ভয়, হতাশা থেকে মুক্তি।

ইতঃপূর্বে তারাই বড় বড় সাফল্য অর্জন করেছে, যারা নিজেদের মধ্যে বড় লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করেছে। তুমি যখন তোমার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করবে তখন কাজ করা হবে আনন্দের ব্যাপার। শর্ত হলো ইতিবাচক মনোভাবের সাথে চেষ্টা করা।

ইতিবাচক মনোভাবের জন্য কিছু লোক সাফল্যের চূড়ায় ওঠে এবং অবস্থান করে। অন্যদিকে কিছু লোক নিচে পড়ে থাকে। আবার কিছু কিছু লোক সাফল্যের চূড়া থেকে ঠাস করে নিচে পড়ে যায়। তার কারণ নেতিবাচক মনোভাব আবার কি! ইতিবাচক মনোভাব হলো যে ঘটনার প্রতি তোমার ঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। এর আছে সুন্দর জিনিস আকর্ষণ করার ক্ষমতা। আর নেতিবাচক মনোভাব এগুলোকে দূরে ঠেলে দেয়। একমাত্র নেতিবাচক মনোভাবই পারে তোমার জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিতে। তাই তোমার উচিত ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা। তুমি যদি ইতিবাচক মনোভাব গঠন করতে চাও তাহলে তোমাকে বেশি বেশি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে হবে। তুমি যদি মুসলমান হও তাহলে প্রতিদিন অনুবাদসহ পবিত্র কুরআন পাঠ করো। আর অন্যরা যে ধর্মই পালন করুক না কেন নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারো। এতে হৃদয়, মন ও মস্তিষ্ক পবিত্র হবে।

সৃষ্টিকর্তার কাছে রাস্তা চাও, সমস্যা সমাধানের পথ চাও। তুমি কি জানো, যদি একজন ব্যক্তি পরিবর্তন হয়, তবে বিশ্ব ঠিক হবে? এর দ্বারা বোঝায় তুমি যদি তোমার বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চাও, তবে তোমার নিজেকে দিয়েই আরম্ভ করতে হবে। তুমি যদি ঠিক হও, সৎ হও, তাহলে তোমার বিশ্ব ঠিক হবে। আর তুমি যদি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারো, তবে তোমার কাছে বিশ্বের সকল সমস্যা সুযোগ হয়ে দেখা দিবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজের কাজ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ে ভুগে। তবে তুমি কি ভেবেছ, তুমি জন্মের পূর্বে কত বড় লড়াই জিতে বিজয়ী হয়েছ? জেনেটিক বিশেষজ্ঞ আমরাম শিনফেলড বলেছেন, "এই সমগ্র বিশ্বে অতীত ইতিহাসে তোমার মতো কেউ আসেনি আর ভবিষ্যতেও কেউ আসবে না।" একটু চিন্তা

করো, এক কোটি স্পার্মের মধ্যে এক বিশাল লড়াই হয় এবং সেই লড়াইয়ে মাত্র একজন হয়েছে বিজয়ী। সেই বিজয়ী কেবল তুমি। এই এক কোটি স্পার্ম কোষের মধ্যে একটি দৌড় প্রতিযে-াগিতা হয়। সকলের লক্ষ্য থাকে একটাই- ডিম্বকের নিউক্লিয়াসে পৌঁছাতে হবে। তারা প্রত্যেকেই তাদের জীবন রক্ষার জন্য এক কঠোর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এই লাখ লাখ স্পার্মের প্রতিটির মাথায় থাকে ২৩টি ক্রোমোজোমের এক অমূল্য সম্পদ। এই ২৩টি ক্রোমোজোমে থাকে তোমার বংশ পরিচয়। এরা ডিম্বকের নিউক্লিয়াসে পৌঁছানোর জন্য একে অপরের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে দ্রুত ও সুস্থ স্পার্মটি নিউক্লিয়াসে গিয়ে পৌঁছায়। আর তুমি! তুমিই সেই বিজয়ী যে কোটি স্পার্মের সাথে লড়াইয়ে জয়ী হয়ে পৃথিবীতে বীরদর্পে পদার্পণ করেছ। তাই আজকে তোমার সামনে যে বাধা তার সাথে লড়াই করে জয়ী হওয়ার ক্ষমতা তোমার তো জন্ম থেকেই আছে। দরকার কেবল একটু উপলব্ধি করার, একটু ঘাম ঝরানোর। আমরা প্রায়ই এমন অনেক কাজ করে ফেলি যা আমরা করতে চাই না। এটা আমাদের নেতিবাচক অভ্যাসের ফল। এ থেকে মুক্ত হতে আমরা যতই চেষ্টা করি আমরা ততই জড়িয়ে পড়ি। ব্যাপারটা যেন মাকড়সার জালে আটকে পড়া একটি পোকার মতো। অল্প কিছু লোক এ থেকে মুক্ত হতে পারে। তারা অবচেতন মনকে কাজে লাগিয়ে সচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর তুমি তো মাকড়সার জালের পোকা নও, তুমি একজন বিজয়ী মানুষ। তোমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। তুমি নিশ্চয়ই মানসিক জালকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যেতে পার। এটা তোমার পক্ষেই সম্ভব। তুমি যদি ভালো ও কার্যকরী বুদ্ধি পেতে চাও তাহলে তোমার উচিত চিন্তা করা। নিরিবিলি চিন্তা করলে বা পরিকল্পনা করলে মাথায় কার্যকরী বুদ্ধির উদয় হয়। কিছু লোক বলে, "চিন্তা করলে নাকি সময় নষ্ট হয়।" এটা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে চিন্তা হচ্ছে একজন সফল ব্যক্তির মূলভিত্তি। তুমি যদি তোমার সময়ের ১ শতাংশ চিন্তা ও পরিকল্পনা করার জন্য ব্যয় করো তা-ও কিন্তু যথেষ্ট। তবে আমরা এটাকে ব্যয় না বলে বিনিয়োগ বলবো। এক দিনে ২৪ ঘণ্টা। মনে করি, তুমি ১ শতাংশ সময় বিনিয়োগ করতে চাও। ২৪ ঘণ্টায় ১৪৪০ মিনিট। এর ১ শতাংশ ১৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড, প্রায় ১৪ মিনিট বলা যায়। এই ১৪ মিনিটেও তুমি কিন্তু চিন্তা করতে পারো বা পরিকল্পনা করতে পারো। এটা অল্প সময় মনে হলেও আসলে তা নয়। একদিনে ১৪ মিনিট, এক মাসে ৪২০ মিনিট। আর এক বছরে ৫১১০ মিনিট বা ৮৫ ঘণ্টার ওপর। তাই অল্প অল্প করে চিন্তা কর। এই অভ্যাস গঠন করলে দেখবে হঠাৎ তোমার মাথায় প্রয়োজনীয় কাজটির জন্য বুদ্ধি চলে আসবে। আর তুমি টেরও পাবে না।

তারুণ্যের শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে এ দেশ ও আগামীর বিশ্বকে ক্ষুধা-দারিদ্র-বৈষম্যমুক্ত করার অদম্য প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাব আমরা, এই প্রত্যাশায় বুক বেঁধে আছি।